রসিক ভিটা বার্তা

শ্রী সারদা মঠ—রসিক ভিটা—শিক্ষা ও সংস্কৃতি পীঠ

প্রকাশনা—
শ্রী সারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আগস্ট, ২০২২

অক্ষর এবং চিত্রবিন্যাস—
শ্রী সারদা মঠ, রসিক ভিটা
শিক্ষা ও সংস্কৃতি পীঠ
২৪/১, আর এন টেগোর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩৫
ই-মেল : rasikbhita10@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.srisaradamathrb.org

মুদ্রক—
জিপিডি বক্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা - ১৪

এই সংখ্যায়—

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন

নেতাজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

নেতাজী, আজাদ হিন্দ বাহিনী ও ভারতের স্বাধীনতা - গার্গী সমাদ্দার ১৩

আগুনের পরশমণি - ১৬

আমার চোখে ভারত পথিক - রিয়া সরকার - ১৮

ভারত পথিকের প্রচ্ছদ - ৪৪

স্বাধীনতার হোমানলে - ২০

মঙ্গল পাণ্ডে ◆ বিপিনচন্দ্র পাল ◆ উল্লাসকর দত্ত ◆ খড়ক সিং ◆ দামোদর বিনায়ক সাভারকর ◆ তারকনাথ দাস
অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ◆ অনুগ্রহ নারায়ণ সিনহা ◆ কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ◆ বাবা কাঁসিরাম
তারারাণী শ্রীবাস্তব ◆ সুনীতি চৌধুরী ◆ যশোধরা দাসাপ্পা ◆ ভীম্বর দেউরি ◆ ভেনেলাকান্তি রাঘভাইয়াহ
দুগ্গিরাল গোপালকৃষ্ণায়া ◆ সুকদেব থাপার ◆ কনকলতা বড়ুয়া ◆ পোনাকা কনকাম্মা ◆ চারুচন্দ্র বসু
হরিকিষান তলোয়ার ◆ সুচেতা কৃপালানি ◆ রামপ্রসাদ বিসমিল ◆ জি. এ. ভাদিভেলু ◆ হংসজীবরাজ মেহেতা

১২৫ বছর আগের সেই দিনটি - প্রব্রাজিকা নির্বাণপ্রাণা - ৯

১২৫ বছরের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন - ৭

সত্যজিৎ রায় জন্মশতবার্ষিকী - ২৮
সহজকুমার - শর্মিষ্ঠা রায় চৌধুরী - ২৯
আমার প্রিয় চরিত্র - ৩১
পুষ্পালী মুখোপাধ্যায়, বীথিকা ভট্টাচার্য, প্রিয়াঙ্কা দত্ত, স্মরণজিতা দে,
শিঞ্জিনী সরকার, উপাসনা দাস, অন্তরা মান্না

দিলীপকুমার রায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী
মধুর তোমার শেষ যে না পাই - ৭২

হারায়ে খুঁজি সুরের মাঝে - মিতা নাগ - ৪৫

লেখায় রেখায় - শিবজ্ঞানে জীবসেবা - ৪১

গল্পসল্প - ৩৬
একটি বৃষ্টির দিনে - তিয়াসা নাথ, রিয়ার মতো - প্রিয়াঙ্কা সাঁতরা,
একটি খোলা চিঠি - রূপা ঘোষ, শান্তিনীড় - সোমাশ্রী দাস,
বন্ধু যখন বিশ্বাসঘাতক - তিয়াসা গুঁই, আসাম ভ্রমণ - তিয়াসা চন্দ

কল্পনা অল্প না - ৫১
সায়নী বারিক, ঈশা মল্লিক, অঙ্কিতা পল্যে,
শ্রীজিতা সরকার, সৌমি মুখার্জী, দেবলীনা সেনগুপ্ত, স্নেহা দাস

বিশেষ রচনা

'Moses of her People-The Power of Hope' - Tarai Sengupta - 48

ঘুমের দেশে বিজ্ঞানীর বেশে - কস্তুরী বিশ্বাস - ৫৫

খেলা —সেসময় এসময়
ভারতীয় ফুটবলের জনক - নগেন্দ্র প্রসাদ - প্রতীপ দেব - ৫৭
সার্কাসের ইতিবৃত্ত - অনিন্দিতা চক্রবর্তী - ৫৯
থমাস কাপ-এ ভারতের ঐতিহাসিক জয় - মানশ্রী পাঁজা - ৬২

আলোচনা - ৬৩
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'পাশ-ফেল'-এর প্রয়োজনীয়তা

প্রিয় বই, প্রিয় চরিত্র
'রিদয়' নামে ছেলেটি - দিওতিমা হালদার - ৬৬
রসিক রাজা - সুনন্দা সাউ - ৬৭

অচেনা জীবন - ৭০

শিক্ষামূলক ভ্রমণ - ৭৬
মিউজিয়াম—এক অনন্য অভিজ্ঞতা

সংবাদ প্রবাহ - ৭৭

নিবেদন

দীর্ঘ দু-বছর পরে আবার প্রকাশিত হচ্ছে রসিক ভিটা বার্তা। প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবীনতার জয়গান—এ'দুয়ের মেলবন্ধনের প্রচেষ্টায় ব্রতী ২০২২-এর ত্রয়োদশ সংখ্যা।

২০২২ বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উদ্‌যাপন, অন্যদিকে স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী। তাঁর মত, পথ, আদর্শ আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক, কিভাবে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন তমসা থেকে জ্যোতির সন্ধানে, তারই আভাস রইল ভারতপথিকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যে।

১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে পা রেখেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। এই বছর পূর্ণ হচ্ছে তার ১২৫ বছর। স্বামীজীর স্বপ্নের বাস্তবায়নের তিনি ছিলেন অন্যতম ঋত্বিক। সদর্থে পরাধীন, অশিক্ষিত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট মেয়েদের তিনি দেখিয়েছিলেন নতুন দিশা। না, কোনও বিদেশিনীর আদলে নয়—সীতা, সাবিত্রী, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আদর্শে। সেই দিনটিকেও ফিরে দেখেছি আমরা। সঙ্গে রেখেছি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ১২৫ বছর পূর্তির মতো ঐতিহাসিক ঘটনাকে।

আমাদের এগিয়ে চলার পথে সংস্কৃতি একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ঘর থেকে দু-পা ফেলে একটি ধানের শীষের ওপর একটি শিশির বিন্দুর সৌন্দর্যকে যিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছেন, সেই সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ষে রইল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এবছর আমরা হারিয়েছি সংস্কৃতি জগতের অনেক সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে। সেইসব 'তারা'দের কথা তো আছেই, সঙ্গে ক্রীড়াব্যক্তিত্ব নগেন্দ্রপ্রসাদ, দাসত্বমুক্তির নেত্রী হ্যারিয়েট টাবম্যান, সাধক দিলীপকুমার রায়—সকলকে নিয়েই আগামীর পথে এগিয়ে চলেছে রসিক ভিটা বার্তা।

ছাত্রীরা গল্প লিখেছে, কল্পনা করেছে, আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেছে, মহামারী থেকে সঞ্চয় করেছে গভীর সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা। এসব তারা ভাগ করে নিয়েছে অন্যদের সঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদস্পর্শে পবিত্র রসিক ভিটার সবকিছুর ওপরেই রয়েছে তাঁর কৃপাদৃষ্টি। সেই কৃপা সম্বল করে, 'আমি' থেকে 'আমরা'তে উত্তরণ ঘটুক আমাদের। নিবেদিতার মতো সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষকে যেন 'Our People' বলে অনুভব করতে পারি, সেখানে ধনের প্রাচুর্য নিয়ে আসবে না মনের দীনতা, ব্যক্তিস্বার্থের থেকে বড় হবে দেশের স্বার্থ।

১২৫ বছরের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন

যুগের প্রয়োজনে ভগবান বারংবার পৃথিবীতে আসেন অবতাররূপে, পথভ্রষ্ট মানুষকে আলোর দিশা দেখাতে। প্রত্যেকবারেই ভগবানের উদ্দেশ্য বা মিশন নির্দিষ্ট। তার কিছু আমরা দেখতে পাই, কিছুটা প্রকাশিত হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এবারের অবতারে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্তভাবের মধ্যে যে কয়েকটি মিশন এখনও পর্যন্ত পরিস্ফুট হয়েছে, সেগুলিকে ক্রমানুসারে সাজাতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা। জীবসেবাতেও ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, এ শুধু কথার কথা নয়, সত্যসত্যই ভগবানলাভের একটি পথ।

এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, "আজ ঠাকুরের মুখে কী অদ্ভুত কথাই না শুনলাম, ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তবে আজ যা শুনলাম পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে তা শোনাব।" শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শকে ব্যাখ্যা করে স্বামী বিরজানন্দ সহজ করে বলেছেন— "জড় প্রতিমায়, পটে, কাঠে বা শিলায় যদি উপাস্য দেব বা দেবীকে আহ্বান করে অন্তরাত্মা বা ব্রহ্মরূপে পূজা করা যায়, তাহলে জীবে, বিশেষত জীবশ্রেষ্ঠ জীবন্ত মানুষে এইরূপ পূজা করা যাবে না কেন? মানুষের পূজা মানে তার স্থূল দেহের পূজা নয়, তার মধ্যে যে আত্মারূপী নারায়ণ রয়েছেন, তাঁরই পূজা। যে আত্মারূপী নারায়ণ আমার দেহের মধ্যে আছেন, তিনিই সকল নরনারীর দেহে রয়েছেন, এই অভেদদৃষ্টিতে অজ্ঞ, দরিদ্র, রুগ্নরূপধারী নারায়ণকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞানদান, অন্নবস্ত্রদান, ঔষধ ও সেবাশুশ্রূষাদি এই পূজার অঙ্গ।"

দ্বিতীয়ত হল 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ অন্য ধর্মের মানুষকে একথা কখনই বলা হয় না যে তার ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করো। যত মত তত পথ-এর উদ্দেশ্য হল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ উন্নততর চরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠবে, যতক্ষণ না সে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। যে কোন একটি মতের প্রতি একনিষ্ঠ হলেই এটি সম্ভব।

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবর্তিত মতাদর্শ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। আজকের ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলি যে বিষয়গুলিতে গুরুত্ব দেয়, যেমন—দৃষ্টিভঙ্গীর

উদারতা, সকলের সঙ্গে কাজ করার ক্ষমতা, বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে লক্ষ্য স্থির করা ইত্যাদি, তার অন্তরালেও রয়েছে যুগাবতারের উদার, সর্বগ্রাহী ভাব, তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাতরঙ্গে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে একটি যুগের সমগ্র মানব-মনের।

চতুর্থত, মানুষের প্রত্যেকটি কাজের নেপথ্যে আছে ছোট গণ্ডী ভেঙে বড়োর মধ্যে মিশে যাওয়ার ইচ্ছা। সেজন্যই মানুষ চায় স্বাধীনতা, চায় অপরকে ভালবাসতে—"পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে, প্রেমের প্রেরণ।" দস্যুবৃত্তির নৃশংসতার মূলেও কাজ করে সন্তানকে প্রতিপালন করার প্রবৃত্তি যা প্রেমেরই ক্ষুদ্ররূপ। স্বামীজী বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—All that we see in the universe has for its basis this one struggle towards freedom; it is under the impulse of this tendency that the saint prays and the robber robs. When the line of action taken is not a proper one, we call it evil; and when the manifestation of it is proper and high, we call it good. But the impulse is the same, the struggle towards freedom.

ঠাকুরের অবতাররূপে জন্মগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল—জগতে মাতৃভাব প্রচার। ঠাকুর সারা বিশ্বের সামনে রেখে গিয়েছিলেন জগজ্জননী শ্রীসারদা দেবীকে যার মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল মাতৃশক্তির মহিমা। তবে 'মাতৃভাব'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল নিঃস্বার্থ ভালবাসা—নারী, পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ এই ভাব গ্রহণ করতে পারে।

ঠাকুরের এইসব মৌলিক ভাব যাতে হারিয়ে না যায়, সমস্ত মানুষের মধ্যে যাতে সেগুলিকে সঞ্চারিত করা যায়, সেজন্য স্বামীজী গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেন, "মা আমি তাঁরই বাণী প্রচার করতে চাই এবং সেজন্য যত সত্বর সম্ভব একটি স্থায়ী সংঘ স্থাপন করতে চাই।" মা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।" সে কথা শুনে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে বললেন, "আশীর্বাদ করুন মা, তাই যেন হয়। আমার পরিকল্পনা যেন সত্বর ফলপ্রসূ হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে ১৮৯৭ সালের ১মে স্বামীজী আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন তথা রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাস্তবিক শ্রীশ্রীমায়ের প্রেরণা ও প্রার্থনার ফল এই রামকৃষ্ণ মিশন, যা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবঘন তনু।

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা শুধুমাত্র রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী নন, তিনি সংঘের রক্ষাকর্ত্রী, পালনকারিণী, সংঘজননী। সংঘের শৈশব অবস্থায়, (চারাগাছ যখন বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়) শ্রীশ্রীমা সংঘকে বহু দুর্যোগ এবং সংকটলগ্নে আক্ষরিক অর্থেই রক্ষা করেছেন। শুধু তাই নয়, আদর্শ ও পথ নিয়ে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি সংঘের সন্ন্যাসীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন।

স্বামীজী চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের মতো মাকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ নারী পরিচালিত একটি স্বাধীন স্ত্রী-সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে। ওঁর ইচ্ছা ছিল, মেয়েদের মঠ আগে হবে, সেই অনুযায়ী তিনি নিয়মকানুনও নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু সেসময়ে সামাজিক পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় মঠ স্থাপন হয়েছিল অনেক বছর পরে ১৯৫৪ সালে, শ্রীশ্রীমার জন্মশতবর্ষে। এক অলক্ষ্য দৈব নির্দেশে স্ত্রী-মঠের প্রথম অধ্যক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতার ছাত্রী প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা মাতাজী, যাঁর জীবন গড়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা।

এই বছর রামকৃষ্ণ সংঘ ১২৫ বছরে পা রেখেছে। জগতের হিতে বিভিন্নভাবে নিরলস ও নিষ্কাম কর্ম করে চলেছে প্রতিনিয়ত। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণে যে সত্যযুগের সূচনা হয়েছে, ১২৫ বছরে তার উন্মোচন হয়েছে সামান্যই, আরও কত ভাবের যে স্ফূরণ ঘটবে, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তার নাগাল পাওয়া কঠিন। শুধু এইটুকুই মনে রাখতে হবে, পথ এখনও শেষ হয়নি। এ যাত্রা দ্বৈত থেকে অদ্বৈতে, ক্ষুদ্রতর সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যে।

১২৫ বছর আগের সেই দিনটি

প্রব্রাজিকা নির্বাণপ্রাণা

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি। মোম্বাসা জাহাজ স্পর্শ করল ভারতের মাটি, কলকাতা বন্দরে। সেই জাহাজ থেকে ভারতের মাটিতে প্রথম পা দিলেন এক বিদেশিনী মিস মার্গারেট নোবল, যিনি জন্মসূত্রে আইরিশ, জাতিতে ইংরেজ। তাঁকে ভারতে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলেন বিশ্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের নারী সমাজকে জাগানোর জন্য স্বামীজী এই বিদেশিনী নারীকে এদেশে নিয়ে এলেন। কারণ সে সময়ে আমাদের পরাধীন দেশ সেই উপযুক্ত নারী তৈরি করতে পারছে না। এদেশে এসে মিস মার্গারেট নোবল হলেন ভারত-উপাসিকা নিবেদিতা—আক্ষরিক অর্থেই তিনি এদেশে নিজেকে অর্ঘরূপে সম্পূর্ণই নিবেদন করে দিয়েছিলেন। নিবেদিতার ভারতে আসার ১২৫ বছর হল। এই ঘটনার তাৎপর্য বহুমুখী। মহাকালের বুকে এ যাত্রা ছিল পূর্বনির্ধারিত। এর উৎস খুঁজতে আমাদের আরও পিছিয়ে যেতে হবে যখন মার্গারেটের বয়স নয় বছর। সে সময়ে তাঁর পিতা ধর্মযাজক স্যামুয়েল নোবল মৃত্যুশয্যায়। চির বিদায় নেওয়ার আগে তিনি স্ত্রীকে বলে গেলেন, "ভগবান যেদিন মার্গারেটকে ডাক দেবেন সেদিন বাধা দিওনা যেন ... ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি ... ও এসেছে একটা বড় কিছু করার জন্য।" পিতার ভবিষ্যৎবাণী মার্গারেটের জীবনে সত্যি হয়েছিল। সেই দূরের আকাশ হল ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ থেকে আগত হিন্দু যোগীর সংস্পর্শে এসে মার্গারেটের জীবন আমূল পরিবর্তিত হল—যেন রূপান্তর ঘটল। তিনি তাঁর সম্ভাবনাময় জীবন, মান-যশ, আরাম-ভোগসুখ পরিত্যাগ করে এলেন এক পরাধীন, অচেনা ও দরিদ্র দেশে। সত্যিই এ ত্যাগ অতুলনীয়!

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি প্রধান ব্রত ছিল দেশমাতৃকাকে পুনরুজ্জীবিত করা। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই তিনি তা উদ্‌যাপন করবার আদেশ পেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে যে সংঘ তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর গুরুভাইরা অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আজ তা একটি মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ঘুমন্ত, ভীত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তোলা এবং স্বামীজীর ভাবনাকে বাস্তব করে তোলা—একাজ নিবেদিতাই সফল করে তুলেছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতার ভেতর সেই শক্তি ও তেজ দেখতে পেয়ে লিখেছিলেন (৭ জুন ১৮৯৬), "তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরও অনেক শক্তি আসবে।" আবার ২৯ জুলাই ১৮৯৭-এ লিখেছিলেন, "এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যত রয়েছে।" নিবেদিতার ভেতর এমন সম্ভাবনা দেখে স্বামীজী তাঁকে এদেশে নিয়ে এসেছিলেন। আমরা দেখব এই আগমন কতটা তাৎপর্যময়।

ভারতে আসার পর স্বামীজীর প্রচেষ্টায় এবং

আশীর্বাদে নিবেদিতা হয়ে উঠলেন নিবেদিতপ্রাণ ভারতকন্যা—ভারত-সংস্কৃতির ধারক—একজন ভারতীয়ের থেকেও বেশি ভারতীয়।

পাশ্চাত্যে ভারতের বিজয় পতাকা উড়িয়ে স্বামীজী দেশে ফিরে দেখলেন এই ঘুমন্ত জাতিকে সর্বপ্রথম ধাক্কা মেরে জাগাতে হবে। তাই তীব্র কশাঘাত করে ভারতকে জাগাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তাঁর দেহত্যাগ হওয়ার পর গুরুর আরব্ধ কাজগুলিকে সফল করার জন্য নিবেদিতা ভারত-যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—একাধারে সেবিকা, বান্ধবী ও মাতা হয়ে। গুরু এবং তাঁর আদর্শের প্রতি নিবেদিতা এতটাই খাঁটি ছিলেন যে কোন বাধাই তাঁর কাছে বাধা ছিল না। তিনি তাঁর শরীর পর্যন্ত ভুলে ধূপের মতো নিজে পুড়ে চারদিক সুগন্ধে পূর্ণ করেছিলেন।

দেশাত্মবোধ জাগাতে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুটে বেরিয়েছেন স্বামীজীর বাণীর আগুনে যুবসম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করতে। দেশের রাজনৈতিক নেতা—যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের নেপথ্যে থেকে শ্রীঅরবিন্দকে সহায়তা করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন কারণ তাঁর ব্রত ছিল জাতি গঠন— "My aim is Nation-Making"।

বিদেশে নিবেদিতা ভারতবর্ষের সমর্থনে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতের জন্য সহানুভূতি ও সহমর্মিতা তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তিনি তাঁর নিজের পরিচিতি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে পরাধীন ভারতের শাসকদের এদেশের দাবী ও প্রয়োজনের কথা বলে তাদের সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।

স্বামীজী বুঝেছিলেন যে এদেশের দুটি মহাপাপ—নারী ও জনসাধারণকে অবহেলা করা। তাই নারী ও জনসাধারণকে জাগাতে হবে। নিবেদিতা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সেই নারী জাগরণের একটি পদক্ষেপ। শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতার ছিল গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা। সে বিষয়ে পাশ্চাত্যে তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এদেশে এসে স্বামীজীর সংস্পর্শে তিনি পেলেন সনাতন ভারতের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও মাধুর্যের অনুভূতি। ভারত যেন তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে এই গভীর প্রজ্ঞাশীল ও নিবেদিতপ্রাণ মহীয়সী নারীর কাছে তার স্বরূপ খুলে ধরেছিল। নিবেদিতা আইরিশ হয়েও ভারতের অন্দরমহলে ঠাঁই পেয়েছিলেন। এই দুইয়ে মিলে (অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যা কিছু শ্রেষ্ঠ) তিনি হয়ে উঠেছিলেন সেই যোগ্যতম নারী যিনি ভারতের নারীশিক্ষাকে সঠিক দিশা দেখাবেন। এটা ছিল জাতীয় ধারায় গঠিত অথচ আধুনিক যা কিছু মহৎ সব কিছুকে গ্রহণ করে শিক্ষাদানের প্রথম কেন্দ্র—Pioneer। এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে জগৎ দেখল নিবেদিতার অপূর্ব আত্মত্যাগ। বাগবাজারের একটি সরু গলির ভেতরে ছোট্ট একটি বাড়িতে তিনি কী অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছেন! শত অনুরোধেও একটু প্রশস্ত ভাল জায়গায় যেতে রাজি হননি। যাদের জন্য এত করেছেন তাদের ঔদাসীন্য ও অসম্মান কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য রাতের পর রাত জেগে তিনি লিখতেন। তবু যখন প্রয়োজন হত তখন নিজের সামান্য খাবারের খরচেও টান পড়ত। ফলে শরীর দুর্বল হয়ে গেল এবং রক্তাল্পতা দেখা দিল। প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তিনি যে ইহার (বিদ্যালয়ের)

বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাড়ি - বর্তমানে মিউজিয়াম

ব্যয় বহন করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।... নিবেদিতা শুধু শিক্ষা দেননি তিনি শিক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন।" নিবেদিতার এই বিদ্যালয়টি থেকেই পরবর্তীকালে শ্রীসারদা মঠের সূত্রপাত হয়েছিল।

এবার জনগণের কথা। সেই সময় নিবেদিতা আড়াল থেকে নীরবে ভারতের মানব-সম্পদকে প্রেরণা দিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, উজ্জীবিত করেছেন এবং ভারতীয় মনীষাকে সতেজ, সুন্দর ও তেজোদীপ্ত করেছিলেন। সেকালের প্রায় প্রতিটি প্রতিভাবান ভারতীয়ই ভগিনীর কাছে ঋণী। নিবেদিতা জনগণকে হৃদয় দান করেছিলেন। তাই আন্তরিক ভালবাসা মিশিয়ে তিনি যখন ভারতীয় জনগণকে 'Our People' বলে ডাকতেন তখন তাঁর কণ্ঠে যে সুরটি বাজত তা হয়ত কোন ভারতবাসীর কণ্ঠেও বাজত না।

নিবেদিতা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে মায়ের মতো আগলে রেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন পরাধীন দেশের এক বিরল প্রতিভা কিভাবে বঞ্চিত এবং অপমানিত হচ্ছেন। তাই তাঁকে নিবেদিতা সাহায্য করেছেন, অবসাদ থেকে উজ্জীবিত করেছেন। নিবেদিতা বলেছেন, "I felt that his (J.C.Bose) success is his country's success, his struggle India's struggle." ব্যক্তি নয় ভারত-চেতনা ও ভারত-আদর্শের সেবা। এই ছিল নিবেদিতার আদর্শ।

ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' ইংরেজিতে লিখেছেন। তিনি নিবেদিতাকে অনুরোধ করলেন তা দেখে দিতে। নিবেদিতা রাজি হলেন। প্রায় বছর খানেক দিনের পর দিন কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই বিশাল পাণ্ডুলিপি দেখে দেন। কোনও কোনও দিন সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দুজনে খেটেছেন। যেদিন সেকাজ শেষ হয় সেদিন নিবেদিতা তাঁকে শান্ত কণ্ঠে অনুরোধ করেন বইয়ের ভূমিকায় কোথাও যেন দীনেশবাবু নিবেদিতার নাম উল্লেখ না করেন কারণ তিনি কাজ করতে চান নীরবে, নিভৃতে ও নিঃস্বার্থে। দীনেশ সেন বলেছেন, "তিনি (ভগিনী) আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম।.."

শিল্পক্ষেত্রে 'Bengal School of Art' এই নব্যধারার প্রবর্তক—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের অন্তরে ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য এবং মর্যাদা কোথায় তা নিবেদিতা তাঁদের দেখিয়েছেন। নিবেদিতা তাঁদের বুঝিয়েছেন যে পাশ্চাত্য শিল্পকে অনুকরণ করে নয় ভারতীয় শিল্প নিজেই নিজের প্রেরণাস্থল। এরজন্য নিবেদিতা বহু পরিশ্রম ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। প্রধানত নিবেদিতারই অনুপ্রেরণায় এই নবীন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। নিবেদিতা বলেছেন, "ভারতে শিল্পের নবজন্ম চাই-ই। এখন আমরা যার সঙ্গে পরিচিত সেই হবু সাহেবিয়ানার দুঃখজনক অনুকরণ প্রয়াসের দ্বারা তা ঘটবে না।"

কলকাতায় যখন প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দিল তখন ভগিনী নিবেদিতার সেবা কিংবদন্তী হয়ে আছে। সেই সময়ে একদিন একটি রোগাক্রান্ত শিশু নিবেদিতার কোলে তাঁকেই 'মা' বলে ডেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। জনগণের এরূপ সেবা, কর্মকুশলতা, উচ্চ আদর্শ ও মহাপ্রাণতা দেখে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাম দিলেন 'লোকমাতা'।

আমরা অবাক হয়ে যাই যখন দেখি সিন্ধুপারের এই মহীয়সী নারী এদেশে এসে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই কেমন করে অন্তরালে ও অতি সাধাসিধেভাবে থাকা শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা বুঝতে পেরেছেন। শ্রীশ্রী মায়ের মহত্ত্ব আবিষ্কার করে শিহরিত নিবেদিতা বলেছেন যে, শ্রীশ্রীমা বর্তমান পৃথিবীর মহত্তমা নারী। তিনি আরও ভেবেছেন—মা কি পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি, না নতুন আদর্শের প্রথম প্রতিনিধি? আজ একশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে আমরা যা বুঝতে পারছি নিবেদিতা তখনই তা বুঝেছিলেন। নিবেদিতার কাছে মা ছিলেন Eternal Temple, আর মায়ের কাছে তিনি ছিলেন আদরের 'খুকী', 'প্রাণের সরস্বতী'।

নিবেদিতা তাঁর গ্রন্থ 'The Master As I Saw Him' এ ছিলেন স্বামীজীর অনন্য ভাষ্যকার। স্বামীজীর মহান ব্যক্তিত্বের কত গহন সংগ্রাম ও গতি-প্রকৃতি ফুটে উঠেছে নিবেদিতার লেখনীতে যা আমরা আর কোথাও পাই না। এইভাবে নিবেদিতা ভারতের প্রায় প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষ, কবি, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, বিপ্লবী, শিল্পী, লেখক, কর্মী, নারী ও অগণিত যুবককে উদ্দীপিত করেছেন ও ভারতে জাতীয়তা জাগিয়ে তুলতে নিরন্তর ছুটে বেরিয়েছেন। তাঁর একক প্রচেষ্টা অতুলনীয়! ভিতরে যে নিবেদন, যে বিশ্বাস, যে শক্তি ও আগুন থাকলে এমনভাবে নিজেকে আড়ালে রেখে বিপুল কর্মপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া যায় তা ভাবতে গেলে তল পাওয়া যায় না—তাই শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি 'শিখাময়ী'। নিবেদিতা যে ভিতরে কি আগুন বহন করতেন তা লিখেছেন (১৯০৪, কলকাতা) একটি চিঠিতে," ... ভিতরে আমার আগুন জ্বলতো, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ছিল না। এমন কতদিন হয়েছে কলম হাতে নিয়ে বসেছি অন্তরের দাহকে রূপ দেব বলে—কিন্তু কথা জোটেনি। আর আজ আমার কথা বলে বলে শেষ করতে পারি না। দুনিয়ায় আমি যেন আমার ঠিক জায়গাটা খুঁজে পেয়েছি। দুনিয়াও তেমনি আমারই অপেক্ষায় তৈরি হয়ে বসেছিল যেন। এবার তীর এসে লেগেছে ধনুকের ছিলায়।..."

ভারতে এসে নিবেদিতা ১৮৯৮ সালে ১১ মার্চ স্টার থিয়েটারে তাঁর এদেশে আসার কারণ হিসাবে বললেন, "আপনাদের জাতি বিশ্বের সর্বোত্তম অধ্যাত্ম-সম্পদগুলিকে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে পেরেছে। এইজন্যই ভারতবর্ষে এসেছি জ্বলন্ত আগ্রহে তার সেবা করব বলে। ... এমন একদিন আসবে যখন ঐশ্বর্যের ভারে ক্লান্ত, শ্রান্ত প্রতীচ্য অন্তরের শান্তির প্রত্যাশায় আকুল হয়ে তাকাবে। সেদিন ভারতের অনাড়ম্বর দারিদ্র্যকে সে ঈর্ষা করবে। এদেশের শাশ্বত অধ্যাত্মসম্পদের মূল্য সেদিন সে নতুন করে বুঝবে ...।" আমরা কিন্তু আজ একথা ভুলতে বসেছি। পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করাই আজ আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিবেদিতা ১২৫ বছর আগে ভারতের সেবা করতে এসে হয়ে উঠলেন ভারত-সাধিকা—ভারতের পূজারী। তাঁর এমন আত্মদানমূলক নিঃস্বার্থ জীবন দেখে আমরা ভারতবাসীরা কি আজ নিজ-গৃহ, 'নিজ-নিকেতন' এর মহিমায় পূজা নিবেদন করব না? তা যদি না করি তবে এ হবে আমাদেরই পরম নির্বুদ্ধিতা!

নিবেদিতার খিদিরপুর ডকে পদার্পণের ১২৫ বছর পূর্তি স্মরণে
শ্রী সারদা মঠ ও পোর্টট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ

৭৫ বছর
স্বাধীনতার উদ্‌যাপন

নেতাজী, আজাদ হিন্দ বাহিনী ও ভারতের স্বাধীনতা

গার্গী সমাদ্দার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান নিয়ে কিছু কথা আজ পাঠকের সামনে উপস্থাপনা করতে চলেছি। প্রথমেই যে কথাটি আমাদের মনে আসে, সেটি হল এই যে, আমদের দেশে যুগে যুগে বহু মহান নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে নেতাজী বলতে আমরা কেবল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন বুঝি? কারণ তিনি প্রকৃত জননেতা ছিলেন। একটু বিশদভাবে বলার জন্য তাঁর জীবনের দু'একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

নেতাজী যখন ভারতের সীমান্তের দিকে এগোচ্ছেন, সেই সময় একদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর সেনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন, এমন সময় ব্রিটিশ সৈন্যদের তরফ থেকে বোমাবর্ষণের সংকেত আসে। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী সৈন্যদের সুরক্ষিত স্থানে চলে যেতে আদেশ করেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সব সৈন্য নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছে ততক্ষণ তিনি প্রাণসংশয় জেনেও মঞ্চ ত্যাগ করেননি।

INA সেনাদের সঙ্গে নেতাজী

একবার INA সৈন্যবাহিনীতে খাবার খুব কম ছিল। স্বাভাবিকভাবে খাবার ration করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল একটি করে রুটি। নেতাজী যেহেতু সর্বাধিনায়ক, তাঁকে একটু বেশী খাবার ও জল দেওয়া হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করেন। সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি তার সুযোগ নেননি এবং একটিমাত্র রুটি খেয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় কেন তিনি সবার নেতাজী। নেতা তিনিই হতে পারেন যাঁর ত্যাগ সব চাইতে বেশি। সবার খেয়াল যিনি রাখতে পারেন এবং সবার প্রতি যাঁর অপরিসীম যত্ন।

আর একবার INA-এর মহিলা ব্রিগেড রাণী ঝাঁসি বাহিনীতে একজন মহিলা সেনা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর শোকেদুঃখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর স্বামী INA বাহিনীতে ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি প্রাণ দেন। শোকে আকুল ওই মহিলা একাধিকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। জানতে পেরে নেতাজী ওই মহিলাকে ডেকে পাঠান এবং পিতার

স্নেহে ওই মহিলাকে সান্ত্বনা দেন। তাঁর এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একজন সৈন্যের বিধবা স্ত্রীর কথা তিনি ভোলেননি। তিনি তার যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন এবং যত্ন নিতেন। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ত্যাগের কথা বলেছেন, নেতাজীর সারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সেই ত্যাগ আমরা দেখতে পাই।

ভারতের স্বাধীনতা লাভে নেতাজীর প্রকৃত অবদান আজও অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে অজানা। Major General G.D. Bakshi একটি বই লিখেছেন 'Bose: An Indian Samurai' । বইটিতে তিনি লিখেছেন, ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সময় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন Clement Attlee যাঁর সিদ্ধান্তে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। শ্রী বক্সি লিখেছেন যে, Attlee বলেছেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল নেতাজীর INA-এর অবিশ্বাস্য কার্যকলাপ যেখানে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের প্রভাব ছিল ন্যূনতম।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৫৬ সালে Lord Attlee ভারত সফরে এসে কলকাতার রাজভবনে দুদিন ছিলেন। সে সময় মাননীয় পি. বি. চক্রবর্তী ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবংপশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। ব্রিটিশদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিচারপতি চক্রবর্তী এবং Lord Attlee -র মধ্যে সেই সময় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার রচিত 'A History of Bengal' পুস্তকটির প্রকাশককে শ্রীচক্রবর্তী একটি পত্রে লিখেছেন, "My direct question to Attlee was that since Gandhi's Quit India Movement had tapered off quite some time ago and in 1947 no such new compelling situation had arisen as that would necessitate a hasty British departure, why did they have to leave?

In his reply Attlee cited several reasons, the main among them being the erosion of loyalty to the British crown among the Indian Army and navy personnel as a result of the military activities of Netaji. Towards the end of our discussion I asked Attlee what was the extent of Gandhi's influence upon the British decision to leave India. Hearing the question, Attlee's lips became twisted in a sarcastic smile as he slowly chewed out the word 'M-I-N-I-M-A-L'."

ভারতের পূর্ব সীমান্তে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীর অসাধারণ বীরত্ব, বিপুল আত্মত্যাগ, অমানুষিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে দেশের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ সংগ্রামের কথা আপামর ভারতবাসীর কাছে অজ্ঞাতই ছিল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের বিচার হয়, যা বিচারের নামে এক প্রকার প্রহসনই ছিল। সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ, বীরত্ব ও মরণপণ সংগ্রামের কথা জানতে পেরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সারা ভারত। বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতীয় নৌসেনা, বায়ুসেনা ও সামরিক বাহিনীতে যা কাঁপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত। Royal Indian Navy র সাতটি জাহাজের প্রায় ২০,০০০ নৌসেনা লাল কেল্লার ওই বিচার নামক প্রহসনে উত্তেজিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নেতাজীর ছবি নিয়ে বোম্বাই শহরের পথে পথে মিছিল করে। ব্রিটিশ সরকারকে তারা বাধ্য করেছিল 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিতে। সেইসঙ্গে INAর অন্যান্য স্লোগানও। বিদ্রোহী নৌসেনারা জাহাজগুলিতে ব্রিটিশদের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে দেয় এবং ব্রিটিশ উর্ধ্বতন অফিসারদের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। Royal Indian Air Force-এর বায়ুসেনারাও একই সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জব্বলপুর ব্রিটিশ ইউনিটেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন প্রায় প্রতিটি আর্মি ক্যাম্পে টাঙানো থাকত নেতাজীর ছবি। দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেল ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী। তারা বেশ বুঝতে পারছিল ভারতে তাদের শাসনকালের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ১৯৪৬ সালে গোয়েন্দা সূত্রে তারা জানতে পারে যে

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে গান্ধীজী, ১৯৪৫

ভারতীয় সৈন্যরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে এবং যে কোনও সময় তারা ব্রিটিশ অফিসারদের আদেশ অমান্য করতে পারে। ঠিক এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ ভারতীয় সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ব্রিটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। গান্ধী-নেহেরুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাওয়াটাই তখন ব্রিটিশদের কাছে নিরাপদ ও সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের মূল কারণটি হল—নেতাজী গঠিত INAএর বীর সেনানীদের দুঃসাহসিক স্বাধীনতা সংগ্রাম যা সে সময়ে ভারতীয় জনমানসে, বিশেষ করে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, নড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত। আজাদ হিন্দ বাহিনীর ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন এই স্বাধীনতা যুদ্ধে। মেজর জেনারেল জি.ডি.বক্সি বজ্র-নির্ঘোষ কণ্ঠে বারবার ঘোষণা করেছেন, "হমে কহা যাতা হ্যয়—দে দি হমে আজাদী বিনা খড়্গ বিনা ঢাল, শবরমতীকে সন্ত তু নে কর দিয়া কামাল—ইতনা বড়া ঝুট ম্যয় কভি নহী শুনা। হমে আজাদী সির্ফ নেতাজীনে দিলায়া হ্যায়।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কথা পর্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়ত শত শত যুগ ধরে আবর্জনা স্তূপে চাপা পড়ে লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু শীঘ্র হোক বা দেরীতে হোক,—তা আত্মপ্রকাশ করবেই করবে। সত্য অবিনশ্বর।"

স্বামীজীর বাণীর সত্যতা, এতদিন পর্যন্ত স্কুলপাঠ্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের লিখিত ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলেই তা স্পষ্ট হবে। অসত্য ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে চাপা পড়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভে নেতাজী এবং INAএর অতুলনীয় অবদানের কথা ভারতের সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতের নাগরিকের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। সব স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দায়সারাভাবে দু চার লাইনে তা সারা হত। কিন্তু মিথ্যার আবরণ সরিয়ে প্রকৃত সত্য তার আপন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন সময় এসেছে নতুন করে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত ইতিহাস লেখার। অহিংস আন্দোলন নয়—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত INAএর দুঃসাহসিক অভিযানই ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত কারণ।

আগুনের পরশমণি

রাণী ঝাঁসি বাহিনীতে নীরা (বাঁদিক থেকে পঞ্চম, চোখে গগলস)

এমন অনেক আগুন থাকে যার স্পর্শে আমরা পবিত্র হয়ে যাই, এমনই এক আগুনের নাম নীরা আর্য—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্টের এক সৈনিক। সিস্টার নিবেদিতা বলেছিলেন স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র। এই স্বার্থশূন্যতা কোন পর্যায়ে পৌছাতে পারে, নীরা আর্য তাঁর জীবন দিয়ে সেকথাই প্রমাণ করে গেছেন।

১৯০২ সালের ৫ মার্চ বর্তমান উত্তরপ্রদেশে তাঁর জন্ম। পিতার ব্যবসাসূত্রে বেশিরভাগ সময়ই কেটেছে কলকাতায়। কলকাতায় তখন স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার। তার ঢেউ এসে লাগল কিশোরী নীরা আর্যের চেতনায়। নীরা ছিলেন বুদ্ধিমতী, তেজস্বী। শুধুমাত্র আবেগে ভেসে যাওয়ার জন্য তাঁর জন্ম হয়নি। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি চারটি ভাষাতেই তিনি ছিলেন দক্ষ। যোগ দিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের রাণী ঝাঁসি বাহিনীতে। মানুষ চিনতে নেতাজীর ভুল হয়নি। নীরাকে দায়িত্ব দিলেন ইংরেজদের গোপন খবর সংগ্রহ করার। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম গুপ্তচর। এই গুপ্তচরের কাজ ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হত, যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যেত, সেগুলি পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করে দরকারী তথ্যগুলি নেতাজীর কাছে পৌছে দেওয়া হত। আর যদি কেউ ধরা পড়ত, তাহলে শর্ত ছিল সে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলবে। একবার নীরার সহকর্মী দুর্গা জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়ে গেল ইংরেজদের কাছে। তাকে উদ্ধার করতে নীরা ও রাজামণি বৃহন্নলা নর্তকী সেজে উপস্থিত হল ইরেজদের ডেরায়, যেখানে তারা বন্দি করে রেখেছিল দুর্গাকে। অফিসারদের মাদক খাইয়ে, দুর্গাকে উদ্ধার করে কোনরকমে যখন তারা পালিয়ে আসছে, তখন

পাহারাদাররা রাজমণির পায়ে গুলি করল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কোনরকমে তারা সেখান থেকে পালিয়ে, আশ্রয় নিল গাছের ওপর। তিনদিন কাটল তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায়। অবশেষে তারা ফিরে এল আজাদ হিন্দ ফৌজে।

এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়কর। ব্রিটিশ পুলিশের সি.আই.ডি. অফিসার জয়রঞ্জন দাসের ওপর ভার পড়েছিল নেতাজীর ওপর নজরদারির। প্রয়োজনে তাঁকে গুলি করার নির্দেশও ছিল। প্রভুভক্ত জয়রঞ্জন নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। একদিন নেতাজী গাড়িতে ওঠার সময় নেতাজীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল জয়রঞ্জন, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লাগল নেতাজীর ড্রাইভারের গায়ে। রিভলবারের দ্বিতীয় গুলিটা তাক করেছে নেতাজীর দিকে, মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনা। নীরা আর্য বেয়োনেটের পুরোটা গেঁথে দিল জয়রঞ্জনের পেটে। মৃত্যুর আগে জয়রঞ্জন অবাক দৃষ্টিতে তাকালো তার হত্যাকারীর দিকে।

মাত্র তিনমাস আগে জয়রঞ্জন ও নীরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেশের জন্য নিজের বিশ্বাসঘাতক স্বামীকে হত্যা করতেও পিছপা হননি তিনি। আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ বোধহয় একেই বলে।

কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ১৯৪৫ এর আঠার আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এই দুঃসংবাদে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আই.এন.এ। বিচারে অন্যান্যদের মুক্তি হলেও ছাড়া পেলেন না নীরা। ব্রিটিশ কর্মচারী স্বামীকে হত্যার অপরাধে তাঁর জেল হল। প্রথমে কলকাতায়, পরে আন্দামানে। আন্দামান জেলে যখন তাঁকে আনা হল, তিনি দেখলেন সেখানে না আছে কুঁজো, না আছে কম্বল। তাঁর মনে তখন অজানা আশঙ্কা, দ্বীপান্তরে আন্দামানে যদি তিনি দিন কাটান, কেমন করে আসবে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এই ভাবনার কাছে তৃষ্ণা কিংবা শীতবোধ সব তুচ্ছ হয়ে গেল। অনেক রাতে দুটো কম্বল ছুঁড়ে দেওয়া হল বন্দিদের কাছে। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল একটা জানলা। নীরার মনটা যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন বিষণ্ণতা থেকে সামান্য আশার আলো দেখল। তাঁর মনে হল, কোনও একদিন এই ভোরের সূর্যের মতোই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হবে। ভাবনার চিন্তাজাল ছিন্ন হল অচিরেই। পুলিশ অফিসার কামার নিয়ে ঢুকল জেলে। কামার হাতের শেকল খুলতে গিয়ে তুলে ফেলল হাতের চামড়া। পায়ের শেকল ভাঙতে গিয়ে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে মারল হাঁটুতে। আর্তনাদ করে উঠলেন নীরা—কি হল চোখে দেখতে পাওনা? কামারের নির্বিকার জবাব—এখন তুমি কি করতে পারো? চুপচাপ বোসো। অত তেজ দেখিও না। থুতু ছিটিয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন নীরা—মেয়েদের সম্মান করতে শেখো।

এবার কথা বললেন পুলিশ অফিসার। তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব, যদি বলো নেতাজী কোথায় আছেন?

—তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, এ খবর তো সবাই জানে।

—মিথ্যা বলছ তুমি, গর্জে উঠল পুলিশ অফিসার। তিনি বেঁচে আছেন, বলো কোথায় আছেন?

—আমার হৃদয়ে।

—তোমার হৃদয় থেকে উপড়ে দেব তাকে। ইশারা করল কামারকে। কামার একটা ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল নীরার স্তনে। আপ্রাণ চেষ্টা করল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার। হল না। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাকাতর নীরা আর একবার অনুভব করলেন, পরাধীনতার যন্ত্রণা আর নেতাজীর অনুপস্থিতি।

১৯৪৭-এ স্বাধীন হল ভারত। বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেন নীরা। জীবনযাপন করলেন সাধারণ ভারতবাসীর মতো। পেনশন নেননি কোনদিন। হায়দ্রাবাদের ফলকনুমার এক বস্তিতে কুঁড়েঘরে থাকতেন, ফুল বেচে জীবন কাটাতেন। সরকারি জমিতে ঘরটি ছিল বলে ঘরও একদিন ভাঙা পড়ল। অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি ছিলেন চারমিনারের কাছে এক হাসপাতালে। ১৯৯৮ সালে ২৬ জুলাই মৃত্যু হয় তাঁর। শেষকৃত্য করেন স্থানীয় এক সাংবাদিক। কি দিয়ে করেছিলেন শোকজ্ঞাপন? ফুল নয়, আগুন।

এই আগুনই আমাদের দৃষ্টি থেকে সব কালো মুছিয়ে দেবে, আমরা এক নতুন ভারতবর্ষ দেখব।

৭৫ বছর
স্বাধীনতার উদ্‌যাপন

আমার চোখে 'ভারতপথিক'

স্বাধীনতার ৭৫ বছর।
গর্বের, আনন্দের, স্মরণের, উদ্‌যাপনের দিন। সেইসঙ্গে ভারত পথিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একশ পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী। ভারতবাসী হিসাবে নেতাজীর আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের কর্তব্য। রসিক ভিটার ছাত্রীরাও তাঁর আদর্শ, গুণাবলী ও তাঁর আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে। ডিজাইনিং বিভাগের ছাত্রীরা An Indian Pilgrim (ভারতপথিক) বইটির প্রচ্ছদ তৈরি করেছে, নিজেদের ভাবনায়।

এটি নির্বাচিত সেরা লেখা।
আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ চিত্রগুলি প্রকাশিত হল ৪৪ নং পাতায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ভারতপথিক' বইটি নিয়ে আমার অনুভূতির কথা বলার জন্য কলম ধরেছি। বইটির পাতায় পাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যেন জীবন্ত হয়ে নিজের জীবনের কাহিনী বলে চলেছেন। তিনি এক এক করে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার অবতারণা করেছেন এবং সেই সব ঘটনার রস আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো আস্বাদন করেছি।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি পঠন পাঠনের অবকাশে সহপাঠীদের সঙ্গে নানারকমের কৌতুকে মেতে উঠতেন। তারই মধ্যে একটি হল—প্রথম পরিচ্ছেদে অর্থাৎ স্কুলজীবন অংশে তিনি বলেছেন, প্রধান শিক্ষকের বড় ভাইকে তাঁরা সম্বোধন করতেন 'ওল্ড ইয়াং' এবং প্রধান শিক্ষককে সম্বোধন করতেন 'ইয়াং ইয়াং' বলে।

এই পরিচ্ছেদেই তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো অংশটুকু গ্রহণের পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"অল্প বয়সের ছেলেদের উপর জোর করে ইংরেজি শিক্ষা চাপালেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভালো-মন্দ বিচার করার জ্ঞান হবার পর ছেলেদের পাশ্চাত্য দেশে খাঁটি পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় কিছুদিন রাখলে তবে তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভালো জিনিসটুকু গ্রহণ করতে পারবে।" বিদ্যালয়ে ভারতীয় ও আংলো-ইণ্ডিয়ান

ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বৈষম্য তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। এই বৈষম্যবোধের উপলব্ধি থেকেই তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব যে ক্রমশ প্রকট হতে শুরু করে তা তাঁর লেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—"মনে পড়ে নিজেদের মধ্যে আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম, বাইবেল আর পড়বো না, আর নিজেদের ধর্মও কিছুতেই ছাড়বো না।"

সমগ্র বইটিতে সুভাষচন্দ্র বসু নানারূপে নানাভাবে পাঠকদের কাছে ধরা দিয়েছেন। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অপরিসীম। কিন্তু নিজ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার দুর্বার প্রচেষ্টা তাঁকে পিতামাতার অবাধ্য হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে, সেখানে তিনি এক আদর্শবান পুরুষ হিসেবে ধরা দিয়েছেন। একদিকে মহান সেবকের বেশে দিবারাত্র কলেরা আক্রান্ত রোগীর শুশ্রূষায় প্রাণপাত করেছেন, অন্যদিকে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা। নিজের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টায় তিনি দুঃখে, যন্ত্রণায়, কষ্টে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কিন্তু তবু তিনি পরিবর্তনকেই বরণ করে নিয়েছেন। এর ফলে তিনি তাঁর জীবনে কি দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তা বইটি পড়লে অনুভব করা যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এর দ্বিতীয় অংশে দেখা যায়, ত্যাগের মধ্যেই তিনি পরম প্রশান্তি লাভ করেন। এক ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে ইংরেজ প্রফেসরের অশালীন আচরণের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়, তখন তিনি লিখেছেন—"একটা মহৎ উদ্দেশ্যে আমার স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছি এবং আত্মসম্মান বজায় রাখতে পেরেছি, এই কথা ভেবে মনে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিলাম।" এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রথম তাঁর নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা প্রকাশিত হয়েছিল।

দশম পরিচ্ছেদে তিনি দর্শনশাস্ত্রকে অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। জীবনে আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই দর্শন শাস্ত্রকে তিনি মূল উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা যতই এগিয়েছে, ছোট্ট সুভাষের 'নেতাজী' সুভাষ হয়ে উঠার স্বপ্ন ততই বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছে। তাঁর মহান আত্মত্যাগের সূত্রপাত ঘটে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও চাকুরি গ্রহণ না করে দেশের স্বার্থে পদত্যাগ স্বীকার করার মধ্য দিয়ে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্থানান্তরিত হওয়ার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লেখনীতে—"একমাত্র বিদায়ের সময়েই আমরা বুঝতে পারি প্রিয়জনদের আমরা কতখানি ভালবাসি।" এ কারণেই হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বজন হারানোর বেদনা অনুভূত হয়েছে।

সব শেষে বলা যায়, সুভাষচন্দ্র বসু এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সমগ্র ভারতবাসীর মনের মণিকোঠায় নেতাজী রূপেই চিরপ্রতিষ্ঠিত আসন লাভ করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

"নয়ন সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই।"

—রিয়া সরকার
Certificate in Software Technology

বছর
স্বাধীনতার উদ্‌যাপন

স্বাধীনতার হোমানলে

(১)

সিপাহী বিদ্রোহের সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডে বর্তমান উত্তরপ্রদেশের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৯ সালে তিনি বেঙ্গল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৮৫৭ সালে ব্যারাকপুরে প্রথম ইংরেজ বিরোধী অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন তিনি। এই বিরোধিতার শাস্তিস্বরূপ ১৮৫৭ সালের ৮ এপ্রিল তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ব্যারাকপুরে ব্রিটিশ সেনাদের পাণ্ডে যে স্থানে আক্রমণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেখানে তাঁর স্মরণে শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে মহাউদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে।

ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে মহাউদ্যান

(২)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপিন চন্দ্র পাল একটি উল্লেখযোগ্য নাম। একইসঙ্গে তিনি রাজনীতিবিদ, বাগ্মী, সাংবাদিক ও লেখক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আসামের চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের পক্ষ গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসকে বাধ্য করেন। বন্দে মাতরম্ ও নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে 'স্বরাজ'-এর আদর্শ প্রচার করেন। তাঁর লেখা বই এর মধ্যে আছে জেলের খাতা, সত্তর বছর, সোল অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি। ১৯৩২ সালে ২০ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৩)

১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক উল্লাসকর দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। বিপিন চন্দ্র পালের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথমে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। পরে যুগান্তর দলে যোগদান করেন ও বোমা তৈরির প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেন। মুরারিপুকুরের দলীয় সংগঠনের গোপন ডেরা থেকে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কারাগারে তাঁর ওজন বৃদ্ধি হয়। আলিপুর বোমা মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তাঁর লেখা দুটি বই—দ্বীপান্তরের কথা, আমার কারাজীবন।

আন্দামান জেলের একটি কক্ষ

(৪)

শিখদের মুকুটহীন রাজা বাবা খড়ক সিং ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কেন্দ্রিয় শিখ লিগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর নির্দেশেই শিখরা অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। সরকার বিরোধী বক্তৃতার জন্য তাঁকে ডেরাগাজি খান জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বৃটিশ সরকার জেলে গান্ধী টুপি ও পাগড়ির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে, তিনি প্রতিবাদে সমস্ত পোশাক পরিত্যাগ করে শুধু কাছারা পরে থাকতেন। কোনভাবেই তাঁকে তাঁর লৌহদৃঢ় সিদ্ধান্ত থেকে নড়ানো যায়নি। দিল্লিতে তাঁর নামে রাস্তার নামকরণ হয়েছে বাবা খড়ক সিং মার্গ।

(৫)

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা দামোদর বিনায়ক সাভারকর-এর জন্ম মহারাষ্ট্রের নাসিকে। তিনি এবং তাঁর ভাই অভিনব ভারত সোসাইটি নামে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। লণ্ডনে থাকাকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ইতিহাস বিখ্যাত নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁকে। ১৯১১ সালে ৩০ জানুয়ারি মামলার চূড়ান্ত বিচারে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘকাল সেলুলার জেলে বন্দি ছিলেন।

(৬)

বিপ্লবী তারকনাথ দাস তারক ব্রহ্মচারী নামে সন্ন্যাসীর বেশে মাদ্রাজে গিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগান। এই সময় তিনি পুলিশের নজরে আসেন। কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ১৯০৫ সালে জাপান এবং ১৯০৬ সালে আমেরিকা যান।

The Free Hindusthan

আমেরিকায় তিনি 'ফ্রি হিন্দুস্তান' নামে যে পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেটি ছিল কানাডায় প্রথম দক্ষিণ-এশিয় প্রকাশনা। লিও তলস্তয়, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামার মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁকে উৎসাহ দেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি গদর পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯১৬ সালে জার্মানির বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে চিনে গিয়ে সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরের বছর আমেরিকায় ফিরে এসে ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন করেন। মার্কিন সরকার এই অপরাধে তাঁকে ২২ মাস কারাদণ্ড দেয়। শেষজীবনে ভারতবর্ষে ফিরে এসে সমাজসেবামূলক কাজে অতিবাহিত করেন।

(৭)

১৮৮০ সালের ১ জুলাই বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে উত্তরপাড়ায় শিল্পসমিতি স্থাপন করেন। এই সময় অরবিন্দ, বাঘাযতীন প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। বিপ্লবীদের মিলনস্থল রূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে স্বদেশী পণ্যের দোকান স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও ফলস্বরূপ গ্রেফতার ও বন্দি হন। ১৯৩০-৩১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কারারুদ্ধ হলে সারা বাঙলায় ওই আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও কারাবরণ করেন। ১৯৩৭-১৯৪৫ পর্যন্ত কেন্দ্রিয় আইনসভার কংগ্রেস দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ

(৮)

১৮৮৭ সালের ১৮ জুন স্বাধীনতা সংগ্রামী অনুগ্রহ নারায়ণ সিনহা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে চম্পারণ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার ফলে তাঁর কারাদণ্ড হয়। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৪৪ সালে তিনি কারামুক্ত হয়ে মহামারী কবলিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক বিহারের স্থপতি ছিলেন তিনি। সেজন্য তাঁকে 'বিহার বিভূতি' নামে অভিহিত করা হয়।

(৯)

স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৩ সালের ৩ এপ্রিল কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে। বৈবাহিক সূত্রে পদবী চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই রানাডে, গোখলের মতো মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর ভেতরে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বপন করে দিয়েছিল। লণ্ডনে পড়াশোনা করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পেরে দেশে ফিরে দেশের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'সেবাদল'-এ যোগ দেন ও অন্যান্য মহিলাদের যোগদানে উৎসাহিত করে তোলেন। লবণ আইন অমান্যে যোগদান ও কারাবরণ করেন। এ.আই. ডব্লু.সি. এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সারা দেশে এর শাখা গড়ে তুলে, তার মাধ্যমে আইনি সংস্কার ও শরণার্থী পুনর্বাসনের কাজ করেছেন। এছাড়া থিয়েটার নিয়ে আন্দোলন এবং ভারতীয় কুটিরশিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁরই উদ্যোগে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, ক্রাফট্স্ কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া গড়ে ওঠে। রামন ম্যাগসেসে ও পদ্মবিভূষণ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

বাবা বঁলিরামের শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে ইন্দিরা গান্ধী

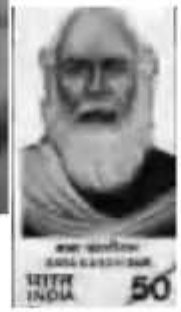

স্মারক স্ট্যাম্প

(১০)

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাবা কাঁসিরাম একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৮৮২ সালে হিমাচল প্রদেশে তাঁর জন্ম। ১৯৩১ সালে ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব এর মৃত্যুদণ্ড তাঁর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কালো পোশাক পরার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই ব্রত পালন করেন। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু তাঁকে পাহাড়ি গান্ধী উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি এগারো বার জেলে যান, জেলে বসে কবিতা লিখে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিরলস যুদ্ধ চালিয়ে যান।

(১১)

মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বিহারের স্বাধীনতা সংগ্রামী তারারাণী শ্রীবাস্তব। ১৯৪২ সালে তিনি ও তাঁর স্বামী ফুলেন্দুবাবু বিহারের সিওয়ানে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের দিকে একটি মিছিলকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ প্রথমে মিছিলে লাঠি চার্জ করে, তারপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হন ফুলেন্দুবাবু। তারারাণী তাঁর শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যান, পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা করেন। ফিরে এসে দেখেন স্বামী শহীদ হয়েছেন। এরপরেও তিনি দমে যাননি, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমরা তাঁকে স্যালুট জানাই।

(১২)

১৯১৭ সালে ২২ মে বিপ্লবী সুনীতি চৌধুরীর জন্ম। তিনি ও শান্তি ঘোষ ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে হত্যা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। নাবালিকা হওয়ার সুবাদে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। মেয়ের অপরাধে বাবার সরকারি পেনশন বন্ধ করা হয়। ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর চেষ্টায় মুক্তি পাওয়ার পর পড়াশোনা করে ডাক্তার হন ও আজীবন নিঃস্বার্থভাবে দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের সেবা করেন।

WOMEN KILL MAGISTRATE

ANARCHY IN BENGAL

REPRISAL FOR POLICE RAID

Special Cable to "The Advertiser"
CALCUTTA, December 14.

Bengal experienced a terrible revival of terrorist activity this morning, when Charles Geoffrey Buckland Stevens, district magistrate and collector, of Comilla, East Bengal, was shot dead by two Indian women anarchists.

This is the first occasion in the history of the terrorist movement that an outrage against officials has been perpetrated by women.

The assassination followed [illegible]

(১৩)

যশোধরা দাসাপ্পার জন্ম ১৯০৫ সালে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি নারীদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করতে উৎসাহিত করেন। সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি কর্ণাটকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছিলেন।

(১৪)

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আসাম রাজ্যের আইনজীবী ভীম্বর দেউরি ১৯০৩ সালের ১৬ মে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ এর ২১-২৩ মার্চ খাসি দরবার হল রেজলিউশন-এর স্থপতি। আদিবাসী নেতারা ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তাদের আবাসভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য রেজলিউশনের সংকল্প করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে আসাম প্লেইন ট্রাইবাল লিগের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর দলীয় প্রচেষ্টায় আসামকে ভারত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(১৫)

স্বাধীনতা সংগ্রামী ভেনেলাকান্তি রাঘভাইয়াহ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের কারণে একুশ মাস জেল হয়। আবার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় গ্রেফতার হন। আদিবাসীদের সেবা কাজের জন্য তাঁকে 'গিরিজান গান্ধী' বলে অভিহিত করা হয়।

(১৬)

১৮৮৯ সালের ২ জুন স্বাধীনতা সংগ্রামী দুগ্গিরাল গোপালকৃষ্ণায়া অন্ধ্রপ্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. করেন। অহিংসা দর্শনে বিশ্বাসী এই মানুষটি কবিতা ও বক্তৃতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অন্ধ্রবাসীকে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করেন। চেরালা কর আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর আহ্বানে চেরালার প্রায় তের হাজার মানুষ গ্রামের উপকণ্ঠে ঝুপড়ি বেঁধে এক বছর বাস করেন। এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন 'রামদান্দু' (দুগ্গিরাল এর স্বেচ্ছাসেবক দল, যাঁদের আদর্শ ছিল স্বরাজ ও আধ্যাত্মিকতা) দলের সদস্যরা। বরমপুরমে তাঁর বক্তৃতায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শেষ জীবন কেটেছিল দারিদ্র্য ও যক্ষায়। তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁকে অন্ধ্ররত্ন বলা হয়।

(১৭)

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের শহীদ সুকদেব থাপার ছোট থেকেই ইংরেজ বিরোধিতার পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। তিনি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর স্কুলে গভর্নর এলে, তিনি তাকে স্যালুট করেননি। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি কোনও ইংরেজকে স্যালুট করেন না। সুকদেব ছিলেন ভগৎ সিং -এর বন্ধু। লাহোরে বোমা বানানোর সময় তিনি ফিরোজপুর থেকে বোমার মশলাপাতি আনতেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধরা পড়েন ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ফাঁসির সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর।

(১৮)

বীরবালা কনকলতা বড়ুয়া মাত্র ১৭ বছর বয়সে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান দেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আসামের গোহপুর মহকুমায় একটি ডেথ স্কোয়ার্ড তৈরি হয়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় থানায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে। কনকলতার নেতৃত্বে নিরস্ত্র গ্রামবাসী মিছিল করে থানার দিকে এগিয়ে চলে। পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে কনকলতা জাতীয় পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে পুলিশ গুলি করে। শহীদ হন কনকলতা। আসামে তিনি বীরবালা নামে পরিচিত।

আসামের তেজপুরে কনকলতা উদ্যানে বর্ণনাত্মক ভাস্কর্য

(১৯)

প্রথম জীবনে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামী পোনাকা কনকাম্মা গান্ধীজীর অহিংস নীতিতেই বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক হিসেবে অন্ধ্রপ্রদেশের পেন্না নদীর তীরে পল্লীপাদু গ্রামে তের একর জমি কিনে তিনি বিপ্লবীদের হস্তান্তর করেন আগ্নেয় অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও গুলি চালনা অনুশীলনের জন্য । এরপর তিনি 'পিনাকিনী সত্যাগ্রহাশ্রম' প্রতিষ্ঠার জন্য জমি দান করেন ও স্বয়ং গান্ধীজী সেই আশ্রমের উদ্বোধন করেন। কনকাম্মা অসহযোগ আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে মহর্ষি রমণের ভক্ত হন। তিনি একজন দক্ষ লেখিকাও ছিলেন। দরিদ্র মেয়েদের জন্য ১৯৫২ সালে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিপিন চন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো বিশিষ্ট নেতারা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

(২০)

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে আজ আমরা এমন একজন শহীদকে স্মরণ করবো যিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলেও মানসিকভাবে ছিলেন অদম্য মনোবলের অধিকারী। তিনি চারুচন্দ্র বসু। শীর্ণ, দুর্বল দেহ এই তরুণের ডানহাত জন্মাবধি অসাড় ছিল। পুলিশের উকিল আশুতোষ বিশ্বাস বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে মামলায় সরকারের পক্ষে সওয়াল করতেন। বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করার সংকল্প করলে চারুচন্দ্র এ কাজের ভার নেন। তিনি অসাড় হাতে রিভলবার বেঁধে বাঁ হাতে গুলি করে কোর্ট প্রাঙ্গণে আশু বিশ্বাসকে হত্যা করেন। তাঁর ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েও পুলিশ কোনও কথা আদায় করতে পারেনি। তিনি শুধু বলেছিলেন, "ভবিতব্য ছিল আশু আমার হাতে নিহত হবে। আমি ফাঁসিতে মরবো। আশু দেশের শত্রু তাই হত্যা করেছি।" ফাঁসিতেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।

(২১)

১৯৩১ সালে ৯ জুন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন হরিকিষান তলোয়ার। পাঞ্জাবের গভর্নর মোরেন্সিকে মারতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল পুনর্বার ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করা। ব্রিটিশ সরকার তাঁর দেহ আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেয়নি, উপরন্তু মিয়ানওয়ালি জেলের পাশেই যেখানে বেওয়ারিশ মুসলিম কয়েদিদের দেহ কবর দেওয়া হয়, সেখানে কড়া পুলিশ পাহারায় তাঁর মৃতদেহের সংকার করা হয়।

(২২)

পাঞ্জাবের আম্বালায় ১৯৩৮ সালে এক ব্রাহ্ম পরিবারে ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী (উত্তর প্রদেশ) সুচেতা কৃপালানির জন্ম। তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন এবং গ্রেফতার হন। পরে দেশভাগের দাঙ্গার কারণে হওয়া মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নকারী উপকমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতাও ছিল প্রশংসনীয়। ১৯৪০ সালে তিনি অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন তিনি নির্জনবাসে থাকেন।

(২৩)

স্বাধীনতা সংগ্রামী রামপ্রসাদ বিসমিল ১৮৯৭ সালে শাহজাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালে মণিপুরী ষড়যন্ত্র ও ১৯২৫ সালে কাকোরি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার বিসমিলকে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফাঁসি দেয়।

(২৪)

১৯২৫ সালের ১২ জুন তামিলনাড়ুতে স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জি.এ. ভাদিভেলু-এর জন্ম। তিনি সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন। পণ্ডিচেরির স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন ও 'সমুদায়ম' নামে জার্নাল প্রকাশ করেন। স্বাধীন ভারতে দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জন্য আন্দোলন করে সতের বার কারাবন্দি হন। তাঁরই জন্য ধর্মপুরী, মাদুরাই-এর দুহাজার ভূমিহীন কৃষক বনভূমি ও রাজস্ব জমির অধিকার পান। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(২৫)

হংসজীবরাজ মেহেতা ছিলেন একাধারে সমাজকর্মী, শিক্ষাবিদ, স্বাধীনতাসংগ্রামী ও লেখিকা। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে দেশসেবিকা দল গঠন করেন। ১৯৩২ সালে কারাবরণ করেন। ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদের অংশ ছিলেন। তিনি ভারতে নারীদের জন্য সমতা ও ন্যায় বিচারের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। SNDT মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। ১৯৫০ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ভাইস চেয়ারপারসন হন। তিনি ইউনেস্কোর কার্যনির্বাহী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তাঁর লেখা বই ত্রাণ নাটকো, রুক্মিনী ইত্যাদি। তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত।

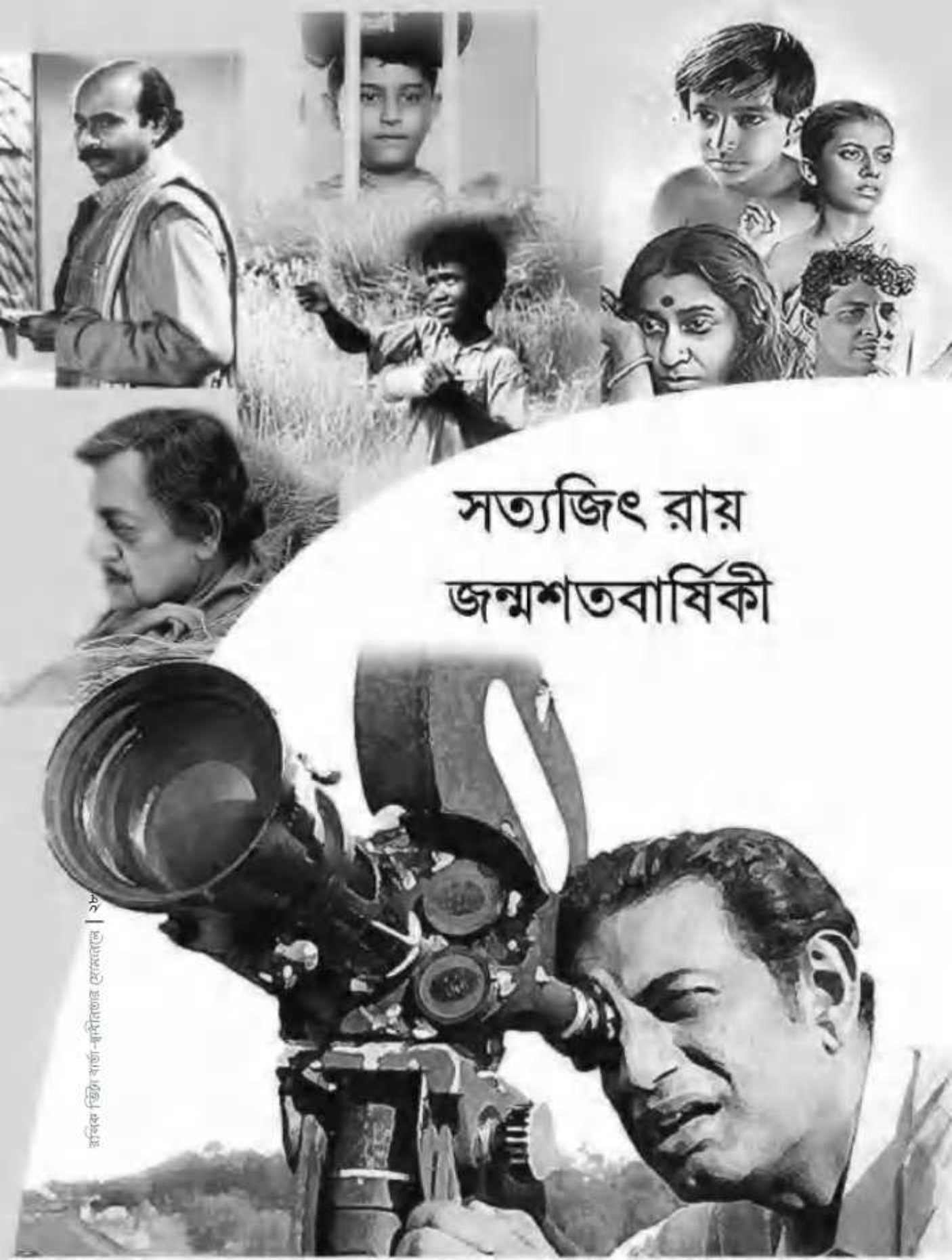

সত্যজিৎ রায়
জন্মশতবার্ষিকী

সহজকুমার

শর্মিষ্ঠা রায় চৌধুরী

সাদা-কালো কুঝিকঝিক...

সালটা ১৯৫৫—আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে প্রথম হয়তো বা অনুভূত হল ভারতবর্ষে সিনে- দুনিয়ার মাধুর্য। বিভূতিভূষণ তো উপন্যাস লিখেছিলেন, কিন্তু তাকে সাদা-কালো সিনেমায় অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তোলাও বোধহয় ওঁর পক্ষেই সম্ভব। গ্রাম বাংলার বর্ষা-শ্যামল রূপে মজেছিল আপামর জগৎবাসী। সেই 'পথের পাঁচালী', নিষ্পাপ শিশুর আশ্বাস—'আমাকে রেলগাড়ি দেখাতে নিয়ে যাবি? নিশ্চয়, তুমি সেরে ওঠো।...'

এমন একটা সিনেমা বানালেন যা কিনা আন্তর্জাতিক দরবারে বাঙালিকে আরও একবার সগর্বে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিলো।

কিন্তু শুরুটা সুখকর ছিল না মোটেই। যথেষ্ট ফান্ডের অভাব তো ছিলই কিন্তু তার সঙ্গে আর এক উপদ্রব—যেখানে প্রথমে শুটিং করলেন, কাশের বনে, সেখানে পরের বার গিয়ে দেখেন ফাঁকা মাঠ। অপেক্ষা করতে হয়েছিল, অপেক্ষা করেছিলেনও, পরবর্তী সময়ে শুটিং স্পট বদলেছিলেন, ফান্ডও জোগাড় হল কিন্তু সেই কাশফুলের দোলায় যে বিশ্ব দরবার এমন দুলবে, সাদা-কালো ট্রেনের কুঝিকঝিক যে তাবড় তাবড় সিনে-বিশেষজ্ঞদের ঘুম ছুটিয়ে দেবে, ট্রেনের হেড লাইট যে এমন ফোকাস আনবে, বাঙালির সিনেমা সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা আমূল পরিবর্তিত হবে, ভেবেছিলেন কি তিনিও? রায় মানে রাজা—ছিলেন, আছেন, থাকবেন, তিনি শ্রী সত্যজিৎ রায়। সদ্য যাঁর জন্মশতবর্ষ পেরল। তাতে কি, বহু আলোকবর্ষ দূরেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়—সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমে যেমন সুভাষ, ধর্মে যেমন বিবেকানন্দ ঠিক তেমনই, বাঙালির নিজেকে বিশ্ববন্দিত করার আরেক নাম, সিনেমাতে সত্যজিৎ।

সোনার মগজ...

সোনার চামচ মুখে, নাঃ, মগজে নিয়ে জন্মেছিলেন এই বাঙালি। দাদু উপেন্দ্র কিশোর সেই সময়কার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। অমন ভালো কালার প্রিন্ট সেই সময় কলকাতা কেন, এশিয়াতেও ছিল না। তার সাথে সাহিত্যিক, চিত্রকর, শিশু সাহিত্যেরও আধার তিনি। সুকুমার রায় তাঁর বাবা। শিশুমননে গভীর ছাপ ফেলে যান যিনি প্রতিনিয়ত, সেই সুকুমারের কাঁধে চেপে বড় হলেন সত্যজিৎ। সাহিত্য যাঁর রক্তে, মজ্জায়, মননে, চিন্তাভাবনায়। খুব কম বাঙালি এমন আছেন যাঁর দক্ষতা সাহিত্য পেরিয়ে ছবি, গান, সুর, চিত্রনাট্য, সর্বমোট মগজাস্ত্রে! মা সুপ্রভা দেবীর কাছেই প্রথম শিক্ষালাভ তাঁর। অসম্ভব ভালো গায়কী ছিল তাঁর মায়ের, বড় গর্ব ছিল ছেলের তাঁর। কিন্তু অকালবৈধব্য

আর দারিদ্র্য বাধ্য করলো আপোষ করতে নিজের সুরের সাধনাতে। চাকরি করতে শুরু করলেন সুপ্রভা দেবী। লক্ষ্য একটাই, সঠিক পথে চালনা করে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ তিনি গড়বেন। হলও তাই।

সূর্যের আলোয় ...

ঠাকুর আর রায় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের। উপেন্দ্র কিশোর আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বন্ধু। মা সুপ্রভা বুঝেছিলেন গড়তে পারে বিশ্বকর্মাই!

রবীন্দ্রনাথ ও সত্যজিৎ—ষাট বছরের ব্যবধান দুজনের। শিখেছিলেন সত্যজিৎ, শান্তিনিকেতনে, রবিছায়ায়। সূর্যের আলোয় বসে আঁকা রপ্ত করেছিলেন সেখান থেকেই। রবীন্দ্রনাথকে জেনেছিলেন নিবিড় ভাবে। প্রথম দেখাটা ভারী মজার—মা সুপ্রভার হাত ধরে অপেক্ষায়, অটোগ্রাফ নেবেন কবিগুরুর। কবিগুরু হাত বাড়িয়ে নিলেন খাতাটা, বললেন পরের দিন গিয়ে নিয়ে আসতে। সেদিনের মানিকের কিছুদিনের মধ্যেই সত্যজিৎ হওয়ার বীজে খানিক সার, জল দিয়েছিলেন সেদিন কবি।

অটোগ্রাফ খাতায় লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবিতা—"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে / বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা/ দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু / দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া / ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া / একটি ধানের শীষের উপরে / একটি শিশির বিন্দু।"

Two ...

চলচ্চিত্র সমালোচকদের মতে প্রায় বিস্মৃত এই সিনেমাটি সত্যজিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নীরবতাও যে সোচ্চারিত তা বাঙালি পরিচালক দেখিয়েছেন এই সিনেমাতে। নিজের মতন করে, বাঙালির মতন করে। যুদ্ধ নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন এই বারো মিনিটের নির্বাক ছবিটিতে। দুটো নিষ্পাপ শিশু, সমাজের দুই স্তরে যারা থাকে তাদের দ্বন্দ্ব কত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সিনেমার মাধ্যমে। যেখানে একজন শক্তির আস্ফালনে বন্দুক উঁচিয়ে নেয় সেখানে আরেকজন পথে বাঁশের বাঁশিতে সুর বেঁধে শান্তির ধ্বজা ওড়ায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই সাদা-কালো ছবিটি আলোড়ন তোলে মানুষের হৃদয়ে, আজও।

৩৪টা বছর ... ১০০০+ ইন্টারভিউ

হবেই তো, উনি যে সত্যজিৎ। প্রসাদ থেকে মানিক... সহজকুমার থেকে সত্যজিৎ... লড়াই ছিল, আছে, থাকবেও। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝেছেন জীবনের অনেকটা সময়, কিন্তু শিরদাঁড়া বাঁকাননি এতটুকু কখনও। সাবলীল আর্টিস্টের উদাহরণ উঠলেই তাই তো বাঙালির সর্বাগ্রে মনে আসে সত্যজিৎ। যিনি যুগের উন্মাদনাকে তুচ্ছ করেও নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, যত নামী অভিনেতাই হোন না কেন, তাঁর সিনেমায় অভিনয় করতে হলে তো জানতে হবে বাংলা কারণ, এই ভাষাতেই তিনি পৌঁছতে চান, পরিচিত হতে চান, স্মৃতিতে থাকতে চান সারা পৃথিবীবাসীর। অস্কার যখন পেলেন, তখন তিনি বেলভিউ নার্সিংহোমে। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট। সিনেমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। পথের পাঁচালী থেকে আগন্তুক... মাঝে অরণ্যের দিনরাত্রি, শাখা প্রশাখা, শঙ্কু, ফেলুদা, সোনার কেল্লা, আবহসঙ্গীত, সূক্ষ্ম রুচিবোধ, দক্ষ চিত্রনাট্য, গান, কবিতা, মগজের সুব্যবহার... এমন বাঙালি হাতে গোনা।

ভাবা সহজ কিন্তু এত সহজে কি সহজকুমার হওয়া যায় নাকি সবাই হয়?

'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।' তিনি মৃত্যুহীন, শাশ্বত, নিত্য, চির নবীন।

তিনি সত্যজিৎ।

আমার প্রিয় চরিত্র

একটি লাল খেরোর খাতা, খাতাটির বিশেষত্ব সেটি সত্যজিৎ রায়ের খসড়া খাতা। সেই খাতার তৃতীয় পাতায় ১৯৬৫ সালে অনেকটা আকস্মিকভাবেই আবির্ভাব ঘটে ফেলুদা ওরফে প্রদোষ মিত্রের। সত্যজিৎ রায়ের আঁকায় ও লেখায় ছয় ফুট উচ্চতার এই কাল্পনিক চরিত্রটি হয়ে উঠেছেন বাঙালির লিভিং লেজেন্ড।

নিখাদ বাঙালিয়ানায়, বলিষ্ঠতায়, সুদৃঢ় কণ্ঠে, গভীর চোখের ভাষায়, অতি সাধারণ শার্ট-প্যান্টে ফেলুদার মস্তিষ্ক-যুদ্ধের কাহিনী বাঙালির কিশোর উপন্যাসকে শীর্ষস্থানে রাখে। জয়কৃষ্ণ মিত্রের পুত্র প্রদোষ মিত্রের ২১, রজনী সেন রোডের কাল্পনিক বাড়ি; বাস্তবের ফেলুদা হতে চাওয়া কত কিশোরের স্বপ্নের ঠিকানা, তার সংখ্যা হিসেব ছাড়িয়ে যায়। ফেলুদার গোয়েন্দাগিরির পথ বড়ই সরল। অপরাধের আশেপাশে লেগে থাকা ক্লু-গুলিকে একযোগে বেঁধে মগজাস্ত্রের দ্বারা সত্য উন্মোচনই ফেলুদার মৌলিকত্ব।

ফেলুদা তাঁর ইন্দ্রজালের জাদুতে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন 'রবার্টসনের রুবি' পর্যন্ত। মোট পঁয়ত্রিশটি গল্পের মধ্যে 'রবার্টসনের রুবি' শেষ প্রকাশিত গল্প। 'আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার' ও 'তোতারহস্য' এই দুটি 'অসমাপ্ত ফেলুদা'র অন্তর্গত। প্রতিটি কাহিনী দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে এই গল্প-উপন্যাসগুলিতে রয়েছে 'সব পেয়েছি'র আনন্দ। তাই ফেলুদা থাকতে বাঙালির ছেলেবেলা চুরির ক্ষমতা কারও নেই।

—পুষ্পালী মুখোপাধ্যায়, কম্প্যাক্ট-৫

দক্ষিণ কলকাতার রজনী সেন রোডের ২১ নম্বর বাড়িতেই থাকতেন বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত গোয়েন্দা ফেলুদা ওরফে প্রদোষ চন্দ্র মিত্তির। ফেলুদা চরিত্রটি সব অর্থেই নাগরিক বুদ্ধিজীবী। তিনি একজন বড় পাঠক, তার উৎসাহ প্রায় প্রতিটি বিষয়েই। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা অসাধারণ। শার্লক হোমস যেমন প্রয়োজন হলে সাহায্য নিতেন তার দাদার, ঠিক তেমনি ফেলুদার আছে সিধু জ্যাঠা। ফেলুদা ওরফে ফেলু মিত্তির একটা চিঠিতে হুমকির রহস্য সামাধান করেন। আর এভাবেই শুরু হয় ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি।

গোয়েন্দা থাকবে আর তার সহকারী থাকবে না, সে তো হয় না। তার সহকারী ছিল তোপসে ওরফে তপেশ রঞ্জন মিত্র। ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি তোপসেকে ছাড়া হয়তো এতটা জমে উঠতো না। তোপসে ফেলুদার খুড়তুতো ভাই। বয়সে কিশোর। তার দৌলতেই ফেলুদার প্রায় সব অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যেত। কেননা সে-ই ফেলুদার সব অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে রাখে। তোপসে ফেলুদার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার বাবা সম্পর্কে ফেলুদার কাকা। ফেলুদা তার কাকার পরিবারের সঙ্গেই থাকেন দক্ষিণ কলকাতার সেই রজনী সেন রোডে।

ফেলুদার গোয়েন্দা গল্পগুলিতে ফেলুদা ও তোপসের পাশাপাশি আরও একটি চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি বা লালমোহনবাবু। লালমোহনবাবুর সঙ্গে ফেলুদার আলাপ রাজস্থান যাওয়ার পথে 'সোনার কেল্লা' গল্পে। গল্পে লালমোহন গাঙ্গুলি ছিলেন সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন। 'সোনার কেল্লা'র পর প্রায় সব কটা গল্পেই জটায়ু উপস্থিত। জটায়ু রহস্য-রোমাঞ্চ গল্পের লেখক। কিন্তু তাকে দেখতে, তাঁর হাবভাব একেবারে উল্টো চরিত্রের। সরল সাদাসিধে একজন বাঙালি। তিনি নামের কাঙাল, আড্ডাবাজ ও ভীতু। কিন্তু সময়ে সময়ে তার মতো সাহসী লোক পাওয়া ভার। গল্পের মধ্যে মজার চরিত্র হিসেবে লালমোহনের উপস্থিতি। ফেলুদা আর তোপসের সঙ্গে বয়সে বড় লালমোহন বন্ধুর মতোই মিশে যান এবং এভাবে মিশে যান বলেই ফেলুদা আর তোপসের পিছনে লাগা থেকে শুরু করে নানান মজাদার ঘটনা তিনি ঘটিয়ে চলেন।

এতক্ষণ গেল ফেলুদা ও তাঁর সহকারীদের পরিচয় পর্ব। এবার আমার কেন এই চরিত্রটি প্রিয় তাতে আসা যাক। আমি ব্যক্তিগতভাবে রহস্য রোমাঞ্চপূর্ণ গল্প পড়তে ভীষণ ভালবাসি। বাংলা সাহিত্যে এরকম গোয়েন্দা গল্পের সংখ্যা কম নয়, তবে ফেলুদার মতো এমন টানটান উত্তেজনাপূর্ণ রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্প বিরল। অন্যান্য অনেক গোয়েন্দা কাহিনীর মতো এর বর্ণনাতে কোন বাহুল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গল্প পড়তে পড়তে কখনও মনে হয় না এই দৃশ্য না আনলেও চলত। ফেলুদার গল্প পড়তে গেলেই বইয়ের ছাপার কালো অক্ষর থেকে বেরিয়ে গল্পের দৃশ্যগুলো চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে। রহস্যগুলোর সমাধান করার ক্ষেত্রেও ফেলুদা অন্যান্য গোয়েন্দা কাহিনীগুলোর থেকে স্বতন্ত্র। ফেলুদার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভূগোল, ইতিহাস সহ নানা বিষয় সম্পর্কে অসামান্য জ্ঞান। ফেলুদার রহস্য গল্পে যে সমস্ত স্থানগুলির উল্লেখ রয়েছে সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সব কিছুই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে রহস্য সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে।

ফেলুদা কাহিনীটির আর একটি দিক—কাহিনীতে রহস্য সমাধানের পাশাপাশি একটা ভ্রমণ কাহিনীও মিশে থাকে যা গোয়েন্দা কাহিনীগুলোকে আরও বেশি জীবন্ত করে তোলে। 'সোনার কেল্লা'য় রাজস্থানের, 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল-এ গ্যাংটকের, 'দার্জিলিং জমজমাট' -এ দার্জিলিংয়ের, 'বাদশাহী আংটি'-তে লক্ষ্ণৌর, 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ বেনারসের, 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডু'-তে নেপালের যে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় তা ভ্রমণকাহিনীগুলির চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। এজন্যই ফেলুদার গোয়েন্দাগল্পগুলি আমার ভীষণ পছন্দের।

—বীথিকা ভট্টাচার্য, কক্ষ্যান্ট - ৮

ফেলুদা সম্পর্কে সন্দীপ রায় লিখেছেন— "এক নতুন চরিত্রের জন্মের আগে, একজন লেখক সাধারণত যে সব প্রাথমিক খসড়া করে থাকেন, উনি তা কিছুই করেননি। গত চার বছরে লেখা অন্যান্য গল্পের মতো সরাসরি আরম্ভ করে দিয়েছেন।"

ফেলুদা হল শৈশব, ব্যোমকেশ যৌবন। ফেলুদার অ্যাডভেঞ্চার আর ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের খেলা। আমার গোয়েন্দা গল্পের হাতেখড়ি ফেলুদা দিয়ে। পড়ার আগেই 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমা দুটি দেখে ফেলি। মগজাস্ত্র ও টেলিপ্যাথি-এর মতো শব্দ প্রত্যেক বাঙালির ঠোঁটস্থ সত্যজিৎ-এর কল্যাণে। লেখকের সাবলীল দৃষ্টিভঙ্গি, অসামান্য চিত্রপট বর্ণনা গল্পগুলিকে সত্যি করে তোলে। পুরোপুরি বাঙালি চালচলনে ফেলুদা সকলের কাছে সমাদৃত হবার কারণ তার সহজ সাধারণ জীবন এবং মগজাস্ত্রের সুনিপুণ ব্যবহার। আর তার এই গুণ পাঠককে আকর্ষণ করেছে বারংবার। তাই আমার চোখে 'ফেলুদা' চিরকাল প্রিয় ও পছন্দের কাল্পনিক গোয়েন্দা চরিত্র হয়ে থেকে যাবে। —প্রিয়াঙ্কা দত্ত, কল্যাস্ট্রি - ৬

সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট চরিত্রগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। তাঁর লেখা প্রত্যেকটি চরিত্র আলাদা করে ভাললাগার অনুভূতি তৈরি করে। তার মধ্যে ফেলুদা সিরিজের লেখাগুলির মধ্যে জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলির চরিত্রটি আমার মনকে বড় আরাম দেয়। ফেলু মিত্তির ও তোপসে যথাক্রমে এক গোয়েন্দা ও তার সহকারী কিন্তু এই দুই অসমবয়সী চরিত্রের সঙ্গে আর এক অসমবয়সী জটায়ু কিভাবে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকেন। মূলত জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলি একজন রোমহর্ষক গল্প উপন্যাসের লেখক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ফেলু মিত্তিরের বিভিন্ন তদন্ত কর্মে তাঁর অনায়াস সঙ্গদান অতি সহজে। চরিত্রটি সৎ, ভীতু কিন্তু মজাদার আনন্দদায়ক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। জটায়ুর সঙ্গসুখ ফেলুদা, তোপসে ও পাঠককে এক অনাবিল আনন্দ দেয়। জটিল রহস্যভেদের সময়গুলিতে তাঁর কথাবার্তা কিংবা ভাবভঙ্গী এমন একটা মুহূর্তের সৃষ্টি করে, যে গুরুগম্ভীর পরিবেশেও মানুষ হেসে ফেলে। বেশিরভাগ মানুষের প্রিয় চরিত্র ফেলুদা। ফেলুদাকে হয়তো ব্যোমকেশ বা শার্লক হোমস এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। জটায়ু কিন্তু অতুলনীয়, এক ও অদ্বিতীয়। তাই তিনি আমার প্রিয় চরিত্র।

—স্মরণজিতা দে, স্যুইং-এ্যট ডিজাইনিং - ৩

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বাংলা চলচ্চিত্র 'আগন্তুক'। এই চলচ্চিত্রে কলকাতায় বসবাসরত একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য সুধীন্দ্র বসু, তার স্ত্রী অনিলা বসু এবং তাদের একটি ছোট ছেলে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে অনীলার মামা অর্থাৎ ছোটমামা মনমোহন মিত্র নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তিনি হঠাৎ এতগুলি বছর পর অনীলাকে চিঠি লেখেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য কলকাতাতে আসছেন এবং তাদের বাড়িতে অতিথি রূপে থাকতে চান। এই আগন্তুক ছোটমামা মনমোহন মিত্র কলকাতাতে আসার পর থেকেই ছবির গল্প শুরু।

এখানে মনমোহন মিত্র চরিত্রটিকে আমার একটি অসাধারণ চরিত্র মনে হয়েছে। কারণ তিনি পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে দেশের বাইরে চলে গেলেও তাঁর দেশের প্রতি টান ছিল। সারা বিশ্ব তিনি চষে বেড়িয়েছেন, থেকেছেন বিভিন্ন দেশে, কিন্তু তাঁর বরাবরই বন্য সভ্যতা পছন্দ। হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ দিয়ে নিজের দেহে ভয়ংকর মাদক রস চালান দিয়ে শমনকে সমন জারি করছে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ তরুণ, বোতাম টিপে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মারা হচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে অরণ্য, শহর। এগুলিকে তিনি সভ্যতা বলে মনে করেননি। আমিও এই কথার সঙ্গে একমত। এছাড়াও তিনি বলেছেন, যে ধর্ম মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, বিভেদ সৃষ্টি করে সেই ধর্ম তিনি মানেন না। মনমোহন মিত্র স্ট্রাগলকে বলেছেন 'মগজ মাংসপেশীর পুষ্টি'। ছবির সবথেকে আকর্ষণীয় অংশ মনমোহন মিত্রের সাথে অনিলার স্বামীর বন্ধু পৃথ্বীশ সেনগুপ্ত এর তর্কযুদ্ধ। অনিলার বৈঠকখানায় চলা সেই

চায়ের কাপে ঝড়ের সংলাপগুলো দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে আজও। মনমোহন চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছেন গুহামানবদের আঁকা বাইসনের কথা, এস্কিমোদের স্থাপত্যবিদ্যার কথা, আদিবাসীদের নিয়ে ভিন্ন দর্শনের কথা। মানব সভ্যতার শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মানো সিনেমার এই আগন্তুক আমাদের শেখান কূপমণ্ডুক না হতে। আর এখানেই তিনি আমাদের সাগরের দিকে এগিয়ে চলার মন্ত্র দিয়ে যান।

—শিঞ্জিনী সরকার, কল্যাণী - ৪

বাংলা ভাষার কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম চরিত্র প্রফেসর শঙ্কু, অন্য নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রফেসর শঙ্কুর প্রথম গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' প্রকাশিত হয়। ১৯৬৫তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'প্রফেসর শঙ্কু'। এই বইয়ের প্রচ্ছদ, অলংকরণ সবই করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৬৭ সালে এই বইটি শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্য হিসেবে আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।

এই প্রফেসর শঙ্কু একজন বৈজ্ঞানিক, পুরো নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। তাঁর লেখা একুশটি ডায়েরি জনৈক তারক চাটুজ্যের কাছ থেকে পাওয়া যায়। সে ডায়েরির পাতা আগুনে পোড়ে না, ছেঁড়া যায় না, রবারের মতো টানলে বাড়ে, ছাড়লে যে কে সেই! সেই ডায়েরির রং ক্রমাগত বদলায়, বিজ্ঞানী শঙ্কুর প্রত্যেকটি ডায়েরিতে কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। আবিষ্কারের সূত্রে ডায়েরিতে রয়েছে বিশ্বভ্রমণের কথাও। তার কাহিনীগুলি সম্ভব কি অসম্ভব, সত্য কি মিথ্যা তার বিচার যেমন দুরূহ, শঙ্কুর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়াও তেমন খুব সহজ নয়। নানা অসম্ভবের মিশ্রণে শঙ্কু নিজেই বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য অনন্য প্রতিভাবান মানুষ।

আগাগোড়া খাঁটি বাঙালি প্রফেসর শঙ্কুর ডায়েরি থেকে জানা যায় গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ধন্বন্তরি চিকিৎসক ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কুর একমাত্র সন্তান তিনি। পিতামহ বটুকেশ্বর ছিলেন তান্ত্রিক। ছোটবেলা থেকেই শঙ্কুকে শিখিয়েছিলেন, জীবনযাপনের জন্য অর্থের

প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু জীবনে শান্তির জন্য কেবলমাত্র টাকার পিছনে ছুটলে চলে না। দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য যদি কিছু করা যায় তবেই জীবন সার্থক হবে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র শঙ্কু বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ষোল বছর বয়সে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যায় অনার্স নিয়ে কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে স্নাতক হন। পরে বাবার পরামর্শে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন নিয়েও পড়াশোনা করেন। কুড়ি বছর বয়সে স্কটিশেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা শুরু। তারপর হঠাৎই অজানা রোগে পিতার মৃত্যু এবং তখনই এই অধ্যাপকের জীবন নানা বিচিত্র পথে চলতে শুরু করে।

শঙ্কুর ডায়েরির ধরণে বোঝা যায় তিনি ভ্রমণ কাহিনী, রহস্য-রোমাঞ্চ, ও অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। সত্যজিতের বর্ণনা অনুসারে শঙ্কুনির্মিত ডায়েরিতে পাখির কথা বলা, বিচিত্র জন্তুর সমাহার, নানান অসম্ভব ক্রিয়াকলাপ, প্রায় জাদুবস্তুর মতো কোনও কোনও প্রাচীন দ্রব্যের আবিষ্কার শঙ্কুর ডায়েরিকে এক উদ্ভট জগতের জাদুঘর করে তুলেছে। সুলেখক শঙ্কু ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন এক বিশ্বাসযোগ্য আজগুবি আজব দুনিয়া, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না। এই অসম্ভব দুনিয়ার বর্ণনার সময় তিনি ব্যবহার করেছেন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, এমন এক যুক্তিক্রম যা শঙ্কুর সমস্ত অ্যাবসার্ডিটিকে এক বাস্তব রূপ দিয়েছে।

বিশ্বাস করা যায় না, তবু আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে থাকে খর্বকায়, বিরলকেশ, তীক্ষ্ণ চাহনির এক বৃদ্ধ যিনি পঁচাত্তর বছর বয়সেও প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও এক দ্বীপে হয়তো বেরিয়েছিলেন কোনও এক অভিযানে। যাঁর জীবনের শুরুটা আমরা জানি কিন্তু শেষটা...

ওটা আমি কল্পনা করি আমার মতো করে, প্রিয় চরিত্র শঙ্কুকে নিয়ে বুনতে থাকি কল্পবিজ্ঞানের নতুন অভিযানের জাল।

—উপাসনা দাস, কল্যাণী - ৫

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রটি বাংলা কল্প-বিজ্ঞান সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় চরিত্র। সত্যজিৎ রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পাঠকদের উৎসাহেই তিনি প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রটি নিয়ে সিরিজ তৈরি করেন। এরপর লেখেন একের পর এক অসাধারণ কল্প-বিজ্ঞানের গল্প।

প্রফেসর শঙ্কুর পুরো নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। তিনি থাকেন বিহারের গিরিডিতে তার চাকর প্রহ্লাদ ও পোষ্য বিড়াল নিউটনের সঙ্গে। তিনি অবিবাহিত, আমরা গল্পে তাঁর পিতা ও পিতামহের নাম পাই। গল্পে আমাদের পরিচয় হয় তাঁর প্রতিবেশী অবিনাশ চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে। তিনি কয়েকবার প্রফেসর শঙ্কুর অভিযানে অংশগ্রহণও করেছেন কিন্তু তিনি ঠিক বিজ্ঞান বিশ্বাসী নন অথচ একটি মজার চরিত্র। প্রফেসর শঙ্কু সিরিজে গল্পগুলির মধ্যে 'প্রফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য', 'স্বপ্নদ্বীপ', 'প্রফেসর শঙ্কু ও রক্ত মৎস্য রহস্য' আমার প্রিয়।

গল্পগুলি থেকে আমরা বিভিন্ন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা জানতে পারি। যেমন—বটিকা ইণ্ডিকা, এয়ারকন্ডিশনিং পিল, অ্যানাইহিলিন পিস্তল, রোবু নামে রোবট ইত্যাদি। প্রফেসর শঙ্কু সৎ, অপরের দুঃখে দুঃখী, নির্লোভ, তাঁর ধৈর্য অসীম আবার তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। তাঁর গল্পগুলি পড়লে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রফেসর শঙ্কুর জগতে হারিয়ে ফেলি। প্রফেসরের সৃষ্টি করা কাল্পনিক যন্ত্র বা ঔষধগুলি সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাকে প্রতি মুহূর্তে আকর্ষণ করে। বারবার মনে হয় এই যন্ত্রগুলি আবিষ্কৃত হলে বা ঔষধগুলি প্রস্তুত করা গেলে কত ভাল হত। প্রফেসর কিন্তু এইসব আবিষ্কার বিশ্ববাসীর জন্য করেছেন এবং তা সকলের কাজে লাগিয়েছেন। প্রফেসরের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির জন্যই প্রফেসরকে কল্পবিজ্ঞানের নায়ক বলা যেতে পারে। সত্যজিৎ রায়ের অনবদ্য লেখার মাধ্যমে প্রফেসর শঙ্কু চরিত্রটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

—অন্তরা মাল্লা, কল্যাণী - ৪